ইমাম হোসাইন (আ.)

দার রাহে হাক প্রকাশনীর লেখকবৃন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহর নামে

জন্ম

হিজরী চতুর্থ সনের শা'বান মাসের তৃতীয় দিনে হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার মহান মর্যাদার অধিকারী এই দ্বিতীয় সন্তান বেলায়েত ও অহী অবতরণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

যখন তাঁর জন্মের সংবাদ ইসলামের সম্মানিত নবী ও রাসূল (সা.)- এর কর্ণগোচর হয় তখন তিনি হযরত আলী ও ফাতেমার গৃহে আগমন করেন। তিনি নবজাতককে তার নিকট আনার জন্যে আসমাকে[২] বলেন। আসমা তাঁকে সাদা কাপড়ে পেচিয়ে রাসূল (সা.)- এর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি শিশুর ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামত পাঠ করেন।[৩]

তাঁর সৌভাগ্যময় জন্মের প্রথম অথবা সপ্তম দিনে অহী অবতীর্ণকারী হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে বলেন :

"হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর সালাম আপনার জন্যে প্রেরিত হোক। আপনি এই নবজাত শিশুর নামকরণ হযরত হারুনের কনিষ্ট পূত্রের 'শুবাইর'[৪]- যা আরবীতে 'হোসাইন' অর্থের সমর্থক নামে করুন।"[৫] কেননা আলীর মর্যাদা আপনার নিকট হযরত মুসার নিকট হারুনের মর্যাদার ন্যায়, পার্থক্য শুধু এটা যে, আপনি আল্লাহর শেষ নবী।

এভাবে এই মহিমাময় নাম 'হোসাইন' আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ফাতেমার দ্বিতীয় সন্তানের জন্যে নির্ধারণ করা হলো।

তাঁর জন্মের সপ্তম দিবসে হযরত ফাতেমা (আ.) আকিকা[৬] হিসেবে একটি দুম্বা ইমাম হোসাইনের জন্যে কোরবানী করেন এবং তাঁর নবজাত শিশুর মাথা মুন্ডন করেন আর সেই কর্তিত চুলের সম ওজনের রূপা আল্লাহর পথে দান করেন।[৭]

হোসাইন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

হোসাইন ইবনে আলীর জন্ম অর্থাৎ হিজরী চতুর্থ বৎসর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর ইন্তেকাল যা তাঁর জন্মের ছয় বৎসর ও কয়েক মাস পরে সংঘটিত হয়- পর্যন্ত জনগণ ইমাম হোসাইনের ব্যাপারে ইসলামের সত্য নবী (সা.)- এর মহব্বত ও স্নেহ- ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ থেকে তৃতীয় ইমামের উচ্চ মর্যাদা ও মহত্বের ব্যাপারে ভালভাবেই ওয়াকিফহাল হয়েছেন।

হযরত সালমান ফারসী বলেন :

"আমি দেখেছি রাসূল (সা.) হোসাইনকে তাঁর হাঁটুর উপর বসিয়ে চুমু খাচ্ছেন আর তখন তিনি বলছেন :

তুমি মহান, মহান ব্যক্তির পুত্র এবং মহান ব্যক্তিবর্গের পিতা। তুমি ইমাম, ইমামের পুত্র এবং ইমামদের পিতা। তুমি আল্লাহর হুজ্জাত (অকাট্য দলিল), আল্লাহর হুজ্জাতের পুত্র এবং আল্লাহর নয়জন হুজ্জাতের পিতা। তাদের শেষ জন শেষ যামানায় কিয়াম করবেন (আল্লাহ তাঁর আগমন ত্বরান্বিত করুক)।[৮]

হযরত আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করছেন :

"যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি আপনার আহলে বাইতের মধ্য থেকে কাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন? তিনি বলেন : "হাসান ও হোসাইনকে।"[৯] প্রায়ই প্রিয় নবী (সা.) হাসান ও হোসাইনকে তাঁর বুকে চেপে ধরে তাদের পবিত্র দেহের সুঘ্রাণ নিতেন এবং তাদের চুম্বন করতেন।[১০]

আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যে : আমি দেখেছি যে রাসূল (সা.) হাসান ও হোসাইনকে তাঁর কাঁধে বসিয়ে আমাদের দিকে আসছেন। যখন তিনি আমাদের কাছে পৌঁছলেন তখন বললেন, যে আমার এই দু'সন্তানকে ভালবাসবে সে আমাকে ভালবাসলো আর যে তাদের সাথে শ তা করবে সে আমার সাথে শ তা করলো।[১১]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইমাম হোসাইনের মাঝে আধ্যাত্মিক ও ঐশী সম্পর্কের প্রাণবন্ত বর্ণনা এবং আন্তরিকতার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ রাসূল (সা.)- এর নিম্নের এই বাক্যটির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন :

“হোসাইন আমা থেকে এবং আমি হোসাইন থেকে।”[১২]

হোসাইন পিতার সাথে

তাঁর জীবনের ছয় বছর তাঁর নানার সাথে অতিবাহিত হয়েছে। যখন রাসূল (সা.) এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিলেন এবং তাঁর প্রভুর সাক্ষাতে চলে যান তখন থেকে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি পিতার সাথে জীবন যাপন করেছেন। যে পিতা কখনো ন্যায় ও ইনসাফ ব্যতীত বিচার করেন নি, পবিত্রতা ও বন্দেগী ছাড়া অতিবাহিত করেননি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু তাঁর দৃষ্টিতে ছিল না, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কিছু প্রার্থনা করেন নি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল না। তিনি এমন পিতা ছিলেন যার শাসনামলে এক মুহূর্তের জন্যে তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়া হয়নি। যেমনি করে তাঁর খেলাফত আত্মসাৎ করার সময়ও তাঁকে কষ্ট দিতে শ রা পিছপা হয়নি। তিনি এ সময়টুকু জান-প্রাণ দিয়ে পিতার নির্দেশের আনুগত্য করেছেন। যে ক'বছর হযরত আলী (আ.) খেলাফতের দায়িত্বে ছিলেন তখন ইমাম হোসাইন (আ.) ইসলামী লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের পথে একজন আত্মোৎসর্গী সৈনিকের ন্যায় তাঁর মহানুভব ভ্রাতার মত প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি জামাল, সিফিফন ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধগুলোতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[১৩]

আর এভাবে তিনি তাঁর মহান পিতা আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.) এবং আল্লাহর দীনের সমর্থন করেছিলেন। এমনকি তিনি লোকজনের উপস্থিতিতে খেলাফত আত্মসাৎকারীদের লক্ষ্য করে প্রতিবাদ করতেন।

একদা হযরত ওমরের শাসনামলে ইমাম হোসাইন (আ.) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। তিনি দ্বিতীয় খলীফাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর মিম্বারে উপবিষ্ট দেখতে পান। খলীফা তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ইমাম সরাসরি মিম্বারের সিঁড়িতে উঠে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করেন : আমার পিতার মিম্বার থেকে নিচে নেমে আসুন...।[১৪]

ভাইয়ের সাথে ইমাম হোসাইন

হযরত আলী (আ.)- এর শাহাদাতের পর রাসূল (সা.)- এর নির্দেশ অনুযায়ী এবং আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর অসিয়ত অনুযায়ী মুসলমানদের নেতৃত্ব ও ইমামতের দায়িত্ব ইমাম আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসান (আ.)- এর উপর অর্পিত হয়। তখন সবার জন্যে তাদের নেতা ইমাম হাসানের আনুগত্য করা ফরজ ছিল। তখন ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর ভাইয়ের সহগামী, সহকর্মী ও সহমর্মী ছিলেন। কেননা তিনি তো মুহাম্মদী অহী ও আলীর বেলায়াতের হাতে লালিত-পালিত হয়েছিলেন ।

অনুরূপভাবে যখন ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এবং মহান আল্লাহর নির্দেশে ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এতসব কষ্ট ও মর্মব্যথা সহ্য করেছিলেন তখনও ইমাম হোসাইন (আ.) ভাইয়ের কষ্টের সাথে শরীক হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি জানতেন যে এই সন্ধি চুক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ বয়ে আনবে, তাই তিনি কখনো ভাইয়ের প্রতিবাদ করেন নি। এমনকি একদিন যখন মুয়াবিয়া ইমাম হাসান ও হোসাইনের উপস্থিতিতে তার অপবিত্র মুখ ইমাম হাসান ও তার মহান পিতা ইমাম আলী (আ.)- কে গালমন্দ করার জন্যে উদ্যত হয়েছিল, ইমাম হোসাইন (আ.) মুয়াবিয়ার বক্তব্য তার অপবিত্র কণ্ঠনালীতে আবদ্ধ করে দেন এবং তার আচরণের জবাব দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে উদ্যত হন। কিন্তু ইমাম হাসান (আ.) তাকে নীরবতার জন্যে আহ্বান জানান । ইমাম হোসাইন (আ.) তাই মেনে নিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্বীয় আসনে ফিরে যান। তারপর ইমাম হাসান (আ.) স্বয়ং মুয়াবিয়ার বক্তব্যের জবাব দিতে উদ্যোগী হন এবং তাঁর স্পষ্ট ও আক্রমণাত্মক বক্তব্যের মাধ্যমে মুয়াবিয়ার অপবিত্র মুখ বন্ধ করে দেন।[১৫]

মুয়াবিয়ার শাসনামলে ইমাম হোসাইন (আ.)

ইমাম হাসানের শাহাদাতের পর রাসূল (সা.)- এর নির্দেশানুযায়ী এবং আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) ও ইমাম হাসানের অসিয়ত অনুসারে মুসলমানদের নেতৃত্ব ও ইমামতের দায়িত্ব ইমাম হোসাইন (আ.)- এর স্কন্ধে অর্পিত হয়। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

ইমাম হোসাইন (আ.) লক্ষ্য করেন যে মুয়াবিয়া ইসলামের শক্তির উপর ভর করে খেলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করে আল্লাহর নির্দেশাবলী পদদলিত করছে ও ইসলামী সমাজের মূলোৎপাটনে বদ্ধ পরিকর হয়েছে। তাই তিনি এই ধ্বংসাত্মক সরকারের কর্মকান্ডে সাংঘাতিক কষ্ট অনুভব করতেন। কিন্তু ইসলামী হুকুমতের আসন থেকে তাকে অপসারিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে পারছিলেন না। যেমনি করে তাঁর ভাই ইমাম হাসান (আ.)ও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ইমাম হোসাইন (আ.) এটা অবহিত ছিলেন যে যদি তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন তাহলে তিনি আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু করার পূর্বেই তাঁকে হত্যা করে ফেলা হবে। তাই নিরুপায় হয়ে ধৈর্যের পথ ধরেন। তিনি জানতেন যদি তিনি তখন কিয়াম করতেন তাহলে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই তাঁকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করা হতো।

আর তাঁর এই নিহত হওয়ার মধ্য থেকে কোন ফলাফল অর্জিত হতো না। সুতরাং যতদিন মুয়াবিয়া জীবিত ছিল ততদিন তিনি তাঁর ভাইয়ের ন্যায় জীবন যাপন করেছেন এবং কোন বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন নি। হ্যাঁ, তিনি কখনো কখনো মুয়াবিয়ার কাজ- কর্ম ও পদক্ষেপের সমালোচনা করতেন আর জনগণকে নিকট ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশার আলো দেখাতেন আর বলতেন অতি সত্বর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যতদিন ধরে মুয়াবিয়া ইয়াযিদের পক্ষে জনগণের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ কার্যক্রম চালিয়েছে ততদিন ইমাম হোসাইন খুব শক্তভাবে তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি কখনো ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন নি

এবং ইয়াযিদের পরবর্তীতে ক্ষমতারোহণকে কোনক্রমেই স্বীকৃতি দেন নি। এমনকি তিনি কখনো কখনো মুয়াবিয়াকে সাংঘাতিক কড়া কথা শুনিয়েছেন এবং তার কাছে কঠোর ভাষায় পত্র লিখেছেন।[১৬]

আর মুয়াবিয়াও ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত নেয়ার জন্যে ইমামকে পীড়াপীড়ি করে নি। এভাবেই ইমাম মুয়াবিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

ইমাম হোসাইনের আন্দোলন

মুয়াবিয়ার পরবর্তীতে ইয়াযিদ ইসলামী হুকুমতের সিংহাসনে আরোহণ করে এবং নিজেকে আমিরুল মুমিনীন বলে ঘোষণা দেয়। সে তার অবৈধ ও স্বৈরাচারী রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামী ও সুপরিচিত ব্যক্তিবর্গের কাছে বার্তা পাঠায় এবং তাদেরকে তার হাতে বাইয়াত করতে আহ্বান জানায়। এই অসৎ উদ্দেশ্যে সে মদীনার গভর্ণরের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে। সেই পত্রে উল্লেখ করে যে 'আমার জন্যে হোসাইনের কাছ থেকে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর আর যদি বিরোধিতা করে তাহলে তাকে হত্যা কর।' গভর্ণর উক্ত সংবাদ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাছে পৌঁছান। তিনি ইমামের কাছ থেকে উত্তর চাইলেন। ইমাম হোসাইন (আ.) উত্তরে এরূপ বলেন :

إِنَّا لِلَّه وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ وَ عَلَى الْإِسْلاَمِ السَّلاَمُ إِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِيْدَ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। ইসলামের বিদায় যখন উম্মতের উপর ইয়াযিদের মত (এমন মদ্যপায়ী, জুয়াড়ি, বেঈমান ও অপবিত্র ব্যক্তি যে বাহ্যিকভাবেও ইসলামের কোন কিছু অনুসরণ করতো না) ব্যক্তি শাসক হয়।"[১৭]

ইমাম হোসাইন অবগত ছিলেন যে এখন যেহেতু তিনি ইয়াযিদের শাসনকে স্বীকৃতি দেন নি, যদি তিনি মদীনায় বসবাস অব্যাহত রাখেন তাহলে তাঁকে হত্যা করা হবে। তাই আল্লাহর নির্দেশে রাত্রির অন্ধকারে এবং গোপনীয়তার সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। মক্কায় তাঁর আগমন এবং ইয়াযিদের হতে বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতির সংবাদ মক্কা ও মদীনার জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি এ খবর 'কুফা' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কুফাবাসীরা মক্কা নগরীতে অবস্থান গ্রহণকারী ইমাম হোসাইনকে তাদের নিকট যাওয়া এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রন জানায়। ইমাম কুফাবাসীদের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে তাঁর চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে আকিলকে কুফা নগরীতে প্রেরণ করেন।

মুসলিম কুফায় পৌঁছলে কুফাবাসীদের অভূতপূর্ব ও উষ্ণ সম্বর্ধনা পান। অসংখ্য মানুষ ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত মুসলিমের হাতে বাইয়াত করে। আর মুসলিমও ইমামের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তিনি ইমামের দ্রুত কুফায় পৌঁছা প্রয়োজন বলে পত্রে উল্লেখ করেন।

যদিও ইমাম হোসাইন (আ.) কুফাবাসীদেরকে খুবভালভাবেই চিনতেন এবং তার পিতা ও ভ্রাতার শাসনামলে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী চরিত্র, অধার্মিকতা ও অবাধ্যতা স্বচক্ষে অবলোকন করেছিলেন। আর তাই জানতেন তাদের প্রতিশ্রুতি ও মুসলিমের সাথে তাদের বাইয়াতকে বিশ্বাস করা যায় না। তারপরও তিনি তারা যেন আর কোন অজুহাত ও ওজর দেখাতে না পারে এবং আল্লাহর আদেশ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে কুফা শহরের দিকে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এ অবস্থায় জিলহজ মাসের অষ্টম দিনে অর্থাৎ যেদিন হাজীরা 'মিনা'-র দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন[১৮] এবং যারা মক্কার পথে রয়ে গিয়েছিলেন তারা অতিদ্রুত মক্কায় পৌঁছতে চেষ্টা করছিলেন সেদিন তিনি মক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন এবং এ দিনে পরিবার- পরিজন ও সঙ্গীদের নিয়ে মক্কা থেকে ইরাকের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। এ কাজের দ্বারা তিনি একদিকে তাঁর উপর মহান দায়িত্ব পালন করেন আবার অন্যদিকে বিশ্ব মুসলমানদেরকেও বুঝিয়ে দেন যে নবী (সা.)- এর সন্তান ইয়াযিদের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেন নি। তিনি ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহন করেন নি বরং তার অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।

ইয়াযিদ কুফা অভিমুখে মুসলিমের যাত্রা এবং তাঁর হাতে জনগণের বাইয়াতের সংবাদ অবহিত হওয়ার পর কুফার নতুন গভর্ণর হিসেবে ইবনে যিয়াদকে (ইয়াযিদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং বনি উমাইয়ার অনুসারীদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ও কঠোর ব্যক্তি) কুফায় পাঠায়।

ইবনে যিয়াদ কুফাবাসীদের ভীরু স্বভাব, দুমুখো আচরণ এবং দুর্বল ঈমানকে ব্যবহার করে তাদেরকে হুমকি ও লোভ দেখিয়ে মুসলিম ইবনে আকিলের চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মুসলিম একাকি ইবনে যিয়াদের অধীনস্থ সৈন্যদের আক্রমনের মোকাবিলা করেন। অবশেষে তিনি সাহস ও বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহর সালাম তাঁর উপর বর্ষিত হোক। ইবনে যিয়াদ কুফার ঈমানহীন, বিশ্বাসঘাতক ও দ্বৈত চেহারার সমাজকে ইমামের

বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। একাজ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে যারা ইমামকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাদের মধ্য থেকে একটা বিরাট অংশ অস্ত্র হাতে নিয়ে ইমাম হোসাইনকে হত্যা করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

ইমাম হোসাইন যে রাত্রিতে মদীনা ত্যাগ করেন যত দিন মক্কা নগরীতে অবস্থান করেছিলেন মক্কা থেকে কারবালায় যাত্রার পথে যেখানেই যাত্রা বিরতি করেছেন প্রতিটি স্থানেই এমনকি শাহাদাত পর্যন্ত কখনও ইঙ্গিতে আবার কখনও সুস্পষ্টভাবে ঘোষনা দিয়েছিলেন : "আমার যাত্রার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করা এবং ইয়াযিদের অনৈসলামী শাসনের প্রতিবাদ করা, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। আর আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মদ (সা.)- এর আনীত দীনকে পুনর্জীবিত করা ব্যতীত আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

যদিও এ আন্দোলনের পরিণতিতে স্বয়ং ইমাম, তাঁর সন্তান ও সঙ্গীদের শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বন্দীত্ব বরণ করে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ই এমন দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন তাই তিনি এমন কঠিন দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যান ।

মহানবী (সা.), আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.) এবং ইমাম হাসানের মত ইসলামের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দ বহুবার ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শাহাদাতের কথা বর্ণনা করেছিলেন। এমন কি মহানবী (সা.) ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্মের সময় তাঁর শাহাদাতের কথা স্মরণ করে কেদেছিলেন।[১৯] আর স্বয়ং ইমাম হোসাইনও ইমামতের জ্ঞানের মাধ্যমে অবহিত হয়েছিলেন যে, তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে এই সফরের ইতি ঘটবে। কিন্তু তিনি তো আল্লাহর নির্দেশ ও আসমানী আদেশের মোকাবিলায় নিজের জীবনের মূল্য বিবেচনা করার মত ব্যক্তিও নন, আর তাঁর পরিবারের বন্দিত্ব অন্তরে রেখাপাত করার মত ব্যক্তি তিনি নন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি বিপদ- আপদকে মর্যাদার উপকরণ এবং শাহাদাতকে সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন (চির কালের জন্যে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

“কারবালাতে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শাহাদাত বরণ”- এর সংবাদ মুসলিম সমাজে এমন ভাবে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল যে ইমামের এ সফরের পরিণতি সম্পর্কে সাধারণ জনগণও অবহিত ছিল।

কেননা এ ব্যাপারটি বিক্ষিপ্তভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.), ইমাম আলী ও ইমাম হাসান (আ.) এবং আরো অন্যান্য বিশিষ্ট মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনেছিল।

এত প্রতিকূলতা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে ইমাম হোসাইনের আন্দোলন অগ্রসর হতে দেখে তাঁর নিহত হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের মনেও প্রবলতর হয়ে উঠে। বিশেষ করে যখন স্বয়ং ইমাম যাত্রা পথে প্রায়ই বলতেন :

مَنْ كَانَ بَاذِلاً فِيْنَا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّنًا عَلَى لِقَآءِ اللهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আমাদের পথে প্রাণ বিসর্জন দিতে এবং আল্লাহর সাক্ষাত লাভে প্রস্তুত সে যেন আমাদের সাথে আসে।”[২০]

আর সে কারণেই তাঁর কিছু হিতাকাঙ্ক্ষীর হৃদয়ে এ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ইমামকে এই সফর থেকে বিরত রাখবে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে একেবারে অসচেতন যে, হযরত আলী (আ.)- এর সন্তান, নবী (সা.)- এর উত্তরসূরী ও ইমাম, অন্যদের চাইতে তাঁর কর্তব্যের ব্যাপারে বেশি সচেতন। তাঁর স্কন্ধে অর্পিত আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব থেকে কখনো তিনি হাত গুটিয়ে নিতে পারেন না।

হ্যাঁ, ইমাম হোসাইন (আ.) এতসব চিন্তা ও মতামতের মাঝে তাঁর পথ চলা অব্যাহত রাখেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তে কেউ সামান্যতম বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি।

অবশেষে তিনি গেলেন, শাহাদাতের সুধা পান করলেন, তিনি শুধু একাই নন বরং সন্তান ও সঙ্গী- সাথীদের সহ, যারা প্রত্যেকে ইসলামের দিগন্তে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, তারা সকলে তাঁর সঙ্গী হলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন এবং তারা কারবালার উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিকে নিজেদের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত করেছেন যেন মুসলমান সমাজ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, ইয়াযিদ (উমাইয়া বংশের পাপ ও অপবিত্র ঐ ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ) কোনমতেই রাসূল (সা.)-

এর উত্তরসূরী নয় আর মূলতঃ ইসলাম বনি উমাইয়া থেকে এবং বনি উমাইয়া ইসলাম থেকে বহু দূরে।

সত্যি কখনো কি চিন্তা করে দেখেছি যে যদি ইমাম হোসাইন (আ.)-এর হৃদয় বিদারক ও বীরত্বপূর্ণ শাহাদাতের ঘটনা না ঘটতো তবে জনগণ ইয়াযিদকে আল্লাহর রাসূলের খলীফা হিসেবে মনে করতো ইয়াযিদও তার অধীনস্থদের অনাচার, অবৈধ যৌনাচার ও অন্যান্য অপকর্মের খবরাখবর তাদের কানে পৌঁছতো এবং তারা সেটিকেই ইসলাম মনে করে কতই না ঘৃণার চোখে দেখতো? কেননা যে ইসলামে রাসূলের খলীফা হিসেবে ইয়াযিদের মত ব্যক্তি সমাসীন হয় তার ব্যাপারে ঘৃণা আসাই স্বাভাবিক। হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র পরিবার বন্দী হলেন। এর মাধ্যমে তারা এ মর্মান্তিক শাহাদাতের সর্বশেষ বাণী মানুষের কানে পৌঁছাতে সক্ষম হন। আমরা শুনেছি এবং পড়েছি যে তাঁরা শহরে শহরে বাজারে বাজারে, বিভিন্ন মসজিদে, ইবনে যিয়াদের দুর্গন্ধময় দরবারে এবং ইয়াযিদের ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডের রাজসভায় অর্থাৎ সর্বদা এবং সর্বত্র তারা মুখ খুলেছেন এবং ফরিয়াদ তুলেছেন আর বনি উমাইয়ার শয়তানী, অপরাধী ও দুর্গন্ধযুক্ত চেহারা থেকে প্রতারণার সুন্দর পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তারা প্রমাণ করেছেন যে কুকুরপ্রেমী ও মদ্যপায়ী ইয়াযিদ এক মূহুর্তের জন্যেও খেলাফতের যোগ্যতা রাখে না। যে সিংহাসনে সে বসেছে এটা তার স্থান নয়। তাদের বক্তৃতাবলী হুসাইনী শাহাদাতের বাণীকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়েছে। তারা এমনভাবে অন্তরসমূহে ঝড় তুলেছেন যে ইয়াযিদের নাম চিরদিনের জন্যে ইতরতা, হীনতা ও নীচতার সমার্থক শব্দ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং তার শয়তানী ও সোনালী আকাঙ্ক্ষাগুলো ধুলোয় মিশে গেছে। নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিই পারবে এ মহান ও সীমাহীন সুফলদায়ক শাহাদাতের সব দিকের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে। তাঁর শাহাদাতের প্রথম দিন থেকে অদ্যবধি তাঁর প্রেমিকগণ, তাঁর অনুসারী যারা মানুষের মহত্ব ও মর্যাদার মূল্য ও সম্মান দিয়ে থাকেন তাদের সকলে প্রতিবৎসর তাঁর শাহাদাত ও মহান আত্মত্যাগের দিবসে কালো কাপড় পরিধান করে এবং শোকপালনের মাধ্যমে সম্মানের সাথে তাঁকে স্মরণ করে থাকেন এবং তাঁর উপর আপতিত মুসিবতসমূহের জন্যে ক্রন্দন ও বিলাপ করে তাদের আন্তরিক ভালবাসার প্রকাশ

করে থাকেন। আমাদের ঐশী ইমামগণ সর্বদা কারবালার ঘটনার বর্ণনা এবং এ ঘটনাকে জীবন্ত রাখার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা নিজেরা তো তাঁর মাজার যিয়ারতে যেতেন এবং তাঁর শোকে বিহ্বল হতেনই তাছাড়াও ইমাম হোসাইন (আ.)- এর জন্যে শোক পালন ও শোকাভিভূত থাকার মর্যাদা ও গুরুত্বের ব্যাপারে অসংখ্য বক্তব্য ও বাণী পেশ করেছেন।

জনাব আবু আম্মারা বলেন :

"একদা আমি ইমাম জা'ফর সাদিক (আ.)- এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকে কবিতা আবৃত্তি করতে বলেন । যখন আমি আবৃত্তি শুরু করি তখন ইমামের কান্নার আওয়াজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমি পাঠ করছিলাম আর তিনি ক্রন্দন করছিলেন। আর কান্নার শব্দ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে বাড়ীর বাহির থেকেও তা শুনা যাচ্ছিল। আমার কবিতা আবৃত্তি সমাপ্ত হলে তিনি মর্সিয়া পাঠে এবং ইমাম হোসাইন (আ.)- এর শোকে মানুষকে কাঁদানোর সওয়াব ও ফযিলতের ব্যাপারে কিছু বক্তব্য পেশ করেন।"[২১]

তিনি আরো বলেছেন :

"ইমাম হোসাইন বিন আলী (আ.)- এর উপর আপতিত মুসিবত ছাড়া অন্য কোন মুসিবতে ক্রন্দন ও বিলাপ করা যথাযথ নয়, কেননা তাঁর মুসিবতে ক্রন্দনের জন্যে মূল্যবান পুরস্কার ও পূণ্য অবধারিত।"[২২]

আহলে বাইতের পঞ্চম ইমাম, মুহাম্মদ বাকেরুল উলুম তাঁর অন্যতম সঙ্গী মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমকে বলেন : "আমাদের অনুসারীদেরকে বল যে তারা যেন হযরত হোসাইনের মাজার যিয়ারতে গমন করেন। কেননা যে ঈমানদার ব্যক্তি আমাদের ইমামতের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের প্রত্যেকের জন্যে হযরত আবা আবদিল্লাহ্ আল হোসাইনের কবর যিয়ারত করা অবশ্য কর্তব্য।[২৩]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন :

إِنَّ زِيَارَةَ ٱلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ أَفْضَلُ مَا يَكُوْنُ مِنَ ٱلأَعْمَالِ

অর্থাৎ “ইমাম হোসাইন (আ.)- এর যিয়ারত যে কোন নেক আমলের চেয়ে অধিক মূল্যবান ও ফযিলতের অধিকারী।”[২৪]

কেননা প্রকৃতপক্ষে এই যিয়ারত এমন এক শিক্ষালয় যেখান থেকে বিশ্ববাসী ঈমান ও সৎ কর্মের শিক্ষা পেয়ে থাকে। বলা চলে, রুহকে পবিত্রতা, পূণ্যতা ও ত্যাগের আধ্যাত্মিক জগতের দিকে যাত্রার উপযোগী করে তোলে। যদিও ইমাম হোসাইনের উপর আপতিত মুসিবতের জন্যে ক্রন্দন ও শোক প্রকাশ করা এবং তাঁর কবর যিয়ারত ও কারবালাতে তাঁর বীরত্বময় ও সম্মানজনক ইতিহাসের স্মরণ ইত্যাদি কর্মসমূহ খুবই মূল্যবান। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা দরকার যে শুধুমাত্র এ যিয়ারত ও কান্না ও মর্মব্যথা উপলব্ধিই যথেষ্ট নয় বরং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আমাদেরকে ধার্মিকতা, উৎসর্গী মনোভাবের লালন ও আসমানী বিধানের পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এতসব কিছুর উদ্দেশ্যও তাই। মনুষ্যত্বের শিক্ষা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করাই হলো হুসাইনী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আর যদি তা অর্জিত না হয় অর্থাৎ যদি শুধুমাত্র বাহ্যিক আচার- অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর পবিত্র উদ্দেশ্যই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে ।

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আচরণ ও শিষ্টাচার

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর ছাপান্ন বছরের জীবনের প্রতি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই যে তাঁর সারাটা জীবন ধার্মিকতা, বন্দেগী ও মোহাম্মাদী রেসালত এবং আমাদের দৃষ্টি ও উপলব্ধির বহু উর্দ্ধের বিষয়ের প্রচারের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে।

এখন তাঁর জীবনের বিভিন্ন অংশ থেকে অল্প কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করছি :

তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে নামাজ আদায় করতেন, আল্লাহর গভীর রাথে গোপন সংলাপে রত হতেন, কোরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন। কখনো তিনি দিবা রাত্রিতে কয়েকশ রাকাত নামাজ আদায় করতেন।[২৫] এমন কি তাঁর জীবনের শেষ রাত্রিতেও তিনি দোয়া প্রার্থনা থেকে বিরত থাকেন নি। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, তিনি কারবালাতে শ দের কাছ থেকে সময় ও সুযোগ চেয়েছেন যেন তাঁর মহান প্রভুর সাথে একাকী প্রার্থনায় বসতে পারেন। তিনি বলেন : আল্লাহ ভাল জানেন যে, আমি নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত, অত্যধিক দোয়া- মুনাজাত ও ইস্তিগফারকে কত ভালবাসি।[২৬]

তিনি অনেক বার পদব্রজে কা'বা গৃহে ছুটে গেছেন এবং হজব্রত পালন করেছেন।[২৭] গালেব আল আসাদীর দু'পুত্র বুশর ও বাশির বর্ণনা করেছেন যে :

একদা আমি হজব্রত পালনের সময় জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ, আরাফাত দিবসের বিকেলে আরাফাতের ময়দানে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)- এর সাথে ছিলাম। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও বন্দেগীর হালতে তাঁবু থেকে বাইরে আসলেন। তিনি সেখানে তাঁর বেশ কিছু সাথী এবং সন্তানদের নিয়ে কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তিনি একজন দুর্বল নিঃস্বের ন্যায় দু'হাত আসমানের দিকে তুলে ধরে নিম্নের এ দোয়া পাঠ করেন।

"সেই আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা, কোন কিছুই যার ইচ্ছা ও বিধান পরিবর্তন করতে পারে না এবং পারে না তাঁর দান ও দয়ার পথরোধ করতে। দয়া ও বদান্যতায় তাঁর হস্ত উন্মুক্ত এবং সব কিছু তাঁর প্রজ্ঞা ও হেকমতের মাধ্যমে সুন্দর এবং দৃঢ়তা লাভ করেছে। গোপনে কর্ম

সম্পাদনকারীদের কোন কাজই তাঁর কাছে গোপন নয়। তাঁর কাছে যা রাখা হয় তা ধ্বংস হয় না। তিনিই সকলকে পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদানকারী, মিতব্যয়ী ব্যক্তিদের অবস্থার সংস্কারক। তিনি দুর্বল ও অসহায়দের করুণা করে থাকেন। তিনি সকল মঙ্গল এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সমৃদ্ধ ও আলোকজ্জল কিতাব আল কোরআনের অবতীর্ণকারী । তিনি দোয়া প্রার্থনাকারীদের শ্রোতা এবং অসুবিধা ও সমস্যা দূরীকরণে একমাত্র ভরসাস্থল। তিনি সৎকর্মশীলদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী এবং জালেমদের আঘাতকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তাঁর কোন সমকক্ষ ও শরীক নেই। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা ও লাতিফ (সুদক্ষ স্রষ্টা, দয়াশীল) [২৮], সজাগ ও সর্বশক্তিমান। প্রভু আমার! আমি তোমার দিকে মুখ ফিরিয়েছি এবং তোমার প্রতিপালকত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি স্বীকার করছি যে তুমি আমার প্রতিপালক আর আমাকে তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আমার অস্তিত্বের পূর্বেই তুমি আমাকে নেয়ামত প্রদান করতে আরম্ভ করেছ। আমাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো...।

অতঃপর আমাকে সুস্থ ও টিহীন দেহে তোমার পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত হেদায়েতসহ পৃথিবীতে এনেছো। আমাকে শিশু অবস্থায় তুমি হেফাজত করেছো এবং বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে আমার জন্যে সুপেয় দুধের ব্যবস্থা করেছো। আমার লালন- পালনকারীদের অন্তরে তুমি আমার মহব্বত ঢেলে দিয়েছো এবং আমার প্রশিক্ষণের জন্যে তুমি সদয় মায়ের ব্যবস্থা করেছো। আমাকে তুমি জ্বিনের গোপন অনিষ্ট ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছো আর অপূর্ণতা এবং টি থেকে হেফাজতে রেখেছো। আর তাই তুমি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হে মহিমাময়, অতিশয় দয়ালু। কথা বলার দিন পর্যন্ত তুমি আমাকে তোমার পরিপূর্ণ নেয়ামত দানে ধন্য করেছো এবং আমার অস্তিত্ব পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তুমি সর্বদা আমাকে লালন করেছো। ইলহামের (বাতেনী জ্ঞানের) মাধ্যমে আমাকে তোমার পরিচয় দান করে আমার প্রতি তোমার হুজ্জাত (দলিল) পরিপূর্ণ করেছো। তুমি তোমার আশ্চর্যজনক হেকমতের মাধ্যমে আমাকে বিস্মিত করেছো এবং আসমান ও যমীনে সৃষ্ট তোমার বিরল সৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে জাগ্রত করেছো। তুমি আমাকে তোমার শোকর আদায় এবং তোমার স্মরণ করার জন্যে সজাগ করেছো। তোমার অনুসরণ ও ইবাদত আমার জন্যে ফরজ

করেছো। তোমার নবী রাসূলগণের আনীত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দান করেছো। তুমি যে কাজে সন্তুষ্ট হও সে কাজ আমার জন্যে সহজ করে দিয়েছো। তুমি এ সকল পর্যায়ে তোমার দয়া ও সাহায্য দ্বারা আমাকে ধন্য করেছো।

ইলাহ্ (উপাস্য) আমার, তুমি আমাকে বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত না দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারো নি। তোমার চিরস্থায়ী দয়া ও মহান দানের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম খাবার, পানীয় দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছো।

যখন তুমি তোমার সকল প্রকার অনুগ্রহ পরিপূর্ণভাবে দান করেছো আর বালা-মুসিবত দূর করেছো তখন আমার অজ্ঞতা এবং ঔদ্ধত্য তোমাকে তোমার নৈকট্যের দিকে আমাকে পরিচালিত করতে বাধা দেয়নি বরং যা তোমার নৈকট্য লাভের জন্যে প্রয়োজন তা দান করে সফলতার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছো।

হে আমার রব! তোমার কয়টা অনুগ্রহ গণনা করবো এবং স্মরণ করবো? তোমার কোন দানের জন্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো? যখন তোমার দান কোন গণনাকারীই গণনা করে শেষ করতে পারবে না এবং সকল হিসেবী সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ। তুমি আমার কাছ থেকে যে সকল বিপদ ও কষ্ট দূর করেছো তা আমার নিকট প্রকাশিত তোমার দেয়া নেয়ামত ও সুস্থতার চেয়েও অনেক গুণ বেশী।

প্রভু আমার! আমি আমার ঈমানের সত্যতার সাক্ষী দিয়ে বলছি যদি ধরে নেয়া হয় আমি সকল সময় এবং সকল যুগে জীবিত থাকবো আর তোমার একটা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের চেষ্টা করবো তারপরও তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তুমি যদি আমাকে অনুগ্রহ কর তাহলেই শুধু সম্ভব, কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার ঐ অনুগ্রহের শোকর আদায় প্রয়োজন হয়ে পড়বে...।

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন অবস্থা দান কর যে আমি যেন তোমাকে এমন ভয় করি যে মনে হয় আমি তোমাকে দেখছি। আমাকে পরহেজগারিতা ও তাকওয়া দানে সৌভাগ্যবান কর এবং পাপ ও গুনাহ্ এবং তোমার নির্দেশ অমান্য করার কারণে আমাকে হতভাগ্য করো না।

হে আমার ইলাহ! তুমি আমার অস্তিত্বে অমুখাপেক্ষিতা, আমার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, আমার কাজে ও আমলে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, নুর ও আলো আমার নয়নে, ধর্মের ক্ষেত্রে অর্ন্তদৃষ্টি ও সচেতনতা দাও এবং আমাকে আমার দেহের অঙ্গ- প্রতঙ্গ দ্বারা উপকৃত কর।

হে আমার উপাস্য, আমি তোমার অনুগ্রহ ও মহামূল্যবান দানসমূহকে গণনা করতে চাইলেও গণনা করতে পারবো না।

হে আমার প্রভ! তুমিই তো আমাকে দয়া করেছো। তুমিই তো অনুগ্রহ করেছো। তুমিই তো করুণা করেছো। তুমিই তো আমার সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করেছো। তুমিই তো তোমার দান পরিপূর্ণতায় পৌছিয়েছো। তুমিই তো রুজি দান করেছো। তুমিই তো ভাল কাজের তৌফিক দিয়েছো। তুমিই তো আমাকে প্রচুর দান করেছো। তুমিই তো আমার প্রয়োজন মিটিয়েছো। তুমিই তো আমাকে পুঁজি দান করেছো। তুমিই তো আমাকে আশ্রয় দিয়েছো। তুমিই তো আমার দুশ্চিন্তা দূর করেছো। তুমিই তো আমাদের হেদায়াত করেছো। তুমিই তো আমাকে বিপদ- আপদ ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করেছো। তুমিই তো আমার অন্যায়কে ঢেকে রেখেছো। তুমিই তো আমাদেরকে ক্ষমা করেছো। তুমিই তো আমাদেরকে মাফ করে দিয়েছো। তুমিই তো আমাদেরকে সাহায্য করেছো। তুমিই তো আমাদেরকে শক্তি দিয়েছো। তুমিই তো আমাদেরকে শক্তি দিয়ে সাহায্য করেছো। তুমিই তো আমাদের রোগ মুক্তি দান করেছো। তুমিই তো আমাদের সুস্বাস্থ্য দান করেছো। তুমিই তো আমাদের সম্মানিত করেছো।

تَبَارَكْتَ رَبِّي وَ تَعَالَيْتَ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ دَائِمًا وَ لَكَ ٱلْشُّكْرُ وَاصِبًا

“হে আমার প্রতিপালক, মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব শুধু তোমারই ভূষণ। সকল প্রশংসা সর্বদা তোমারই জন্যে এবং সকল শোকর সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তোমারি।”

“হে আমার সৃষ্টিকর্তা! আমি আমার অবাধ্যতার স্বীকার করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার সকল পাপ মোচন করে দাও।”[২৯]

সেদিন হোসাইন ইবন আলী এই দোয়া পাঠে আমাদের অন্তরগুলোকে এমনভাবে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন যে, অগণিত জনতা ক্রন্দনে ফেটে পড়ে। তারা সকলে ইমামের দোয়ার সাথে সাথে আমিন বলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলো।

ইবনে আসির 'উসদুল গাবা' গ্রন্থে লিখেন :

كَانَ ٱلْحُسَيْنُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَاضِلاً كَثِيْرَ ٱلصَّوْمِ وَ ٱلصَّلاَةِ وَ ٱلْحَجِّ وَ ٱلصَّدَقَةِ وَ أَفْعَالِ ٱلْخَيْرِ جَمِيْعِهَا

অর্থাৎ "হোসাইন (রা.) প্রচুর রোজা রাখতেন, নামাজ আদায় করতেন, হজ্বে গমন করতেন, দান করতেন এবং সকল ভাল কাজ তিনি করতেন।"[৩০]

হযরত হোসাইন ইবনে আলীর ব্যক্তিত্ব এতই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, আড়ম্বরপূর্ণ এবং মানুষের ধরা- ছোঁয়ার বাইরে ছিল যে, যখন তিনি তাঁর ভাই ইমাম হাসান (আ.)- এর সাথে পদব্রজে হজ্বে গমন করতেন তখন সকল মহান ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বসমূহ তাদের সম্মানে বাহন থেকে নিচে নেমে আসতেন আর তাদের সাথে পথ চলা শুরু করতেন।[৩১]

যে কারণে সমাজের লোকেরা তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতো তা হলো যে তিনি সাধারণ জনগনের মাঝে বসবাস করতেন। তিনি কখনো সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন নি। অন্যান্য সকলের মত সমাজের সুখ দুঃখের সাথে তিনি শরীক ছিলেন। আর এগুলোর চেয়ে ঊর্ধ্বে ছিল আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান যা তাকে একজন জনদরদী মানুষে পরিণত করেছিল। আর তাই যদি না হয় তাহলে তার তো কোন চাকচিক্যময় প্রাসাদ ছিল না, ছিল না কোন বাহিনী ও পাহারাদার। নিম্নের রেওয়ায়েতটি তার সামাজিক নৈতিকতারই একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ।

একদা তিনি একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। সেখানে একদল ফকির তাদের চাদর বিছিয়ে তার উপর বসে তাদের শুকনো রুটি খাচ্ছিল। ইমাম হোসাইন (আ.) তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা ইমামকে তাদের সাথে শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান জানালো। ইমাম তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনি তাদের সাথে খাবার খেলেন। অতঃপর বলেন :

(إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُتَكَبِّرِيْنَ)

অর্থাৎ "আল্লাহ অহংকারীদের ভালবাসেন না।"[৩২]

তারপর তিনি বলেন : "আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। এখন আপনারা আমার দাওয়াত গ্রহণ করুন।" তারাও ইমামের দাওয়াত কবুল করে ইমামের সাথে বাড়ীতে যান । ইমাম নির্দেশ দিলেন বাড়ীতে যা আছে তা যেন মেহমানদের সামনে উপস্থিত করা হয়।[৩৩] আর এভাবে তাদের জন্যে তিনি উষ্ণ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। তিনি তার নিজ কর্ম দ্বারা সমাজকে বিনয় ও মানব প্রেমের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

শুআইব ইবনে আবদুর রহমান খুযায়ী বলেন :

"হোসাইন ইবনে আলী শাহাদাত বরণ করলে জনগণ তাঁর পবিত্র পিঠে কড়ার দাগ দেখতে পায়। এর কারণ ইমাম যয়নুল আবেদীনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : কড়াগুলো ঐ সমস্ত খাদ্যের বস্তার ছাপ যা আমার পিতা রাত্রিতে কাঁধে করে বিধবা মহিলা ও ইয়াতিম শিশুদের ঘরে পৌঁছে দিতেন।"[৩৪]

মজলুম ও অসহায় মানুষের পক্ষে কর্তব্য পালনে ইমাম হোসাইনের অতীব আগ্রহ ছিল। এর পরিচয় আমরা আরিনাব ও তার স্বামী আবদুল্লাহ্ বিন সালামের ঘটনা থেকে বুঝতে পারি :

"ইয়াযিদ যুবরাজের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে, যদিওবা যৌন কামনা চরিতার্থ করণের সব ধরনের উপকরণ যেমন অর্থ, পদবী, নর্তকী ইত্যাদি তার করায়ত্বে ছিল তদুপরি তার নাপাক ও ইতর চক্ষু এক সতী- সাধ্বী গৃহ বধুর উপর পতিত হয়েছিল।

এই অ ীল ও লজ্জাকর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে তার পিতা মুয়াবিয়ার অত্যন্ত শক্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল সেখানে সে ধোকাবাজী ও মিথ্যার মাধ্যমে একজন মুসলমান সতী নারীকে তার স্বামীর ঘর থেকে বের করে তার পুত্র ইয়াযিদের পাপ- জর্জরিত বিছানাতে টেনে আনার সকল প্রাথমিক উপকরণের ব্যবস্থা করে। হোসাইন ইবনে আলী (আ.) এই সংবাদ শুনতে পেয়ে উক্ত অশোভন সিদ্ধান্তের মোকাবিলায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যান। তিনি মুয়াবিয়ার কুচক্রকে নস্যাৎ করে দেন। তিনি ইসলামী আইন অনুযায়ী সেই মহিলাকে তার স্বামী আবদুল্লাহ বিন সালামের কাছে ফিরিয়ে দেন এবং একজন সৎ ও মুসলমান পরিবার থেকে ইয়াযিদের সীমালংঘনকারী হস্ত কর্তন করে দেন। আর এই কাজের মাধ্যমে তিনি তার খোদায়ী সৎসাহস ও

তীব্র আত্মসম্মানবোধের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন এবং মুসলিম সমাজের স ম রক্ষায় তার একান্ত আগ্রহের বিষয়টাই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর এহেন আচরণ ও পদক্ষেপ ইতিহাসের পাতায় হযরত আলী (আ.)- এর সন্তানদের গৌরবময় চরিত্র এবং বনি উমাইয়ার হীনতা ও অত্যাচারী চরিত্রের নিকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে চিরকাল সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।"[৩৫]

জনাব আলায়েলী তার "সুমুয়ুল মানী" গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন : "আমরা মানব জাতির ইতিহাসে এমন সব মহামানবের সন্ধান পাই যারা প্রত্যেকে এক একটি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী নিজেদের মহত্ব ও বিশালতার পরিচয় দিয়েছেন। একজন সাহসিকতার ক্ষেত্রে অন্যজন যুহদ ও দুনিয়া ত্যাগের ক্ষেত্রে আবার আরেকজন বদান্যতার ক্ষেত্রে আবার কেউ বা ভিন্ন কিছু কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.)- এর মহত্ব ও মর্যাদা এতটা প্রসারিত যে, যার প্রতিটি দিকই এতটা অসীম ও অনন্ত যে ইতিহাসের সকল অধ্যায়গুলোতেই শীর্ষস্থান দখল করে আছে। দৃশ্যতঃ মনে হয় তিনি সকল উচ্চ মর্যাদা ও শীর্ষস্থানের সমষ্টি।[৩৬]

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি মুহাম্মদী নবুওয়াতের সীমাহীনতার উত্তরাধিকারী, যে ব্যক্তি হযরত আলী (আ.)- এর ন্যায় পিতার বিচার ও মহানুভবতার সুউচ্চ মর্যাদার ওয়ারিস এবং যে ব্যক্তি হযরত ফাতেমা (আ.)- এর ন্যায় মাতার মর্যাদার আলোক উজ্জ্বলতার উত্তরাধিকারী সে কি করে মানবতার মহত্বের উচ্চতর ও শীর্ষ উদাহরণ এবং খোদায়ী বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রকাশ না হয়ে পারেন। তাঁর উপর আমাদের অসংখ্য দরুদ বর্ষিত হোক। এমন ব্যক্তিকেই আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

ইমাম হোসাইনের জীবন পদ্ধতি, তাঁর শাহাদাত, কথার ধরন ও আচরণগত বিভিন্ন দিক যে শুধুমাত্র ইতিহাসের একজন মহাপুরুষেরই উদাহরণ পেশ করে তাই নয় বরং তাঁর সম্পূর্ণ অস্তিত্বই আত্মসম্মানবোধ, মহানুভবতা, ত্যাগ- তিতিক্ষা ও উৎসর্গী মনোভাব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ও আল্লাহ্ প্রেমের একটি পরিপূর্ণ প্রতিবিম্ব। তিনি স্বয়ং একাই অন্তঃকরণসমূহকে উর্ধ্বলোকের দিকে নির্দেশনা দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এবং পারেন মানবতার সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা দান করতে।

তাঁর জীবন এবং মৃত্যু (শাহাদাত) সব কিছুই মানব জাতির মর্যাদা ও আধ্যাত্মিকতাকে সমুন্নত করেছে।

তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত জীবন গড়ার হৃদয়গ্রাহী কিছু বাণী আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

এক : তিনি বলেন :

أَلْنَّاسُ عَبِيْدُ ٱلْدُّنْيَا وَٱلْدِيْنُ لَعِقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوْطُوْنَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوْا بِالْبَلاَءِ قَلَّ ٱلْدَّيَّانُوْنَ

অর্থাৎ "জনসাধারণ দুনিয়ার গোলাম। ধর্ম তাদের জিহ্বার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অনুভব করবে যে দীনচর্চা তাদের জীবনে কোন ক্ষতি বয়ে আনবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা দীনের চারপাশে ঘুরাফেরা করবে। কিন্তু যখন তারা কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন খুব কম সংখ্যকই দীনের পথে অবিচল থাকে।"[৩৭]

দুই : ইমাম হোসাইন (আ.) তাঁর প্রিয় পুত্র ইমাম যয়নুল আবেদীনকে বলেন :

يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لاَ يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِرًا إِلاَّ اللهَ جَلَّ وَ عَزَّ

"হে বৎস! যে ব্যক্তির আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সাহায্যকারী নেই তার উপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ্ এ ধরনের মজলুমের ফরিয়াদ অতি শীঘ্রই গ্রহণ করে থাকেন।"[৩৮]

তিন : একদা জনৈক ব্যক্তি ইমামের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ রয়েছে এমন কাজ সম্পর্কে লিখার জন্যে আর্জি পেশ করলে তিনি উত্তরে লিখেন :

بِسْمِ اللهِ ٱلْرَّحْمَانِ ٱلْرَّحِيْمِ . أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ رَضِىَ اللهِ بِسَخَطِ ٱلْنَّاسِ كَفَاهُ اللهُ أُمُوْرَ ٱلْنَّاسِ وَ مَنْ طَلَبَ رَضِىَ ٱلْنَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى ٱلْنَّاسِ وَٱلْسَّلاَمُ

অর্থাৎ "আল্লাহর নামে, যিনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান। তারপর এই যে, যে ব্যক্তি মানুষের ক্রোধের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় কাজ করে যায় আল্লাহ মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর ব্যাপারে তার সকল সমস্যার সমাধান করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে রাগান্বিত করে তোলে আল্লাহ্ তাকে মানুষের প্রতিই ছেড়ে দেন, ওয়াসসালাম।"[৩৯]

চার : জনৈক ব্যক্তি ইমাম হোসাইনের কাছে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আমি গুনাহর মধ্যে নিমজ্জিত। আমার এ অবাধ্যতা থেকে পালানোর কোন পথ নেই। আমাকে আপনি উপদেশ দিন। তখন ইমাম বলেন :

إِفْعَلْ خَمْسَةَ أَشْيآءَ وَ أَذْنِبْ مَا شِئْتَ:

فَأَوَّلُ ذَلِكَ : لاَ تَأْكُلْ رِزْقَ اللهِ وَاْذْنِبْ مَا شِئْتَ

وَالْثَّانِي : أُخْرُجْ مِنْ وِلاَيَةِ اللهِ وَاْذْنِبْ مَا شِئْتَ

وَالْثَّالِثُ : اُطْلُبْ مَوْضِعًا لاَ يَرَاكَ اللهُ وَاْذْنِبْ مَا شِئْتَ

وَالْرَّابِعُ : إِذَا جَآءَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رَوْحَكَ فَادْفَعْهُ عَنْ نَفْسِكَ وَاْذْنِبْ مَا شِئْتَ

وَالْخَامِسُ : إِذَا أَدْخَلَكَ مَالِكٌ فِيْ الْنَّارِ فَلاَ تَدْخُلْ فِيْالْنَّارِ وَاْذْنِبْ مَا شِئْتَ

অর্থাৎ "পাঁচটি কাজ যদি করতে পার তবে তুমি যত ইচ্ছা পাপ করতে পার।

প্রথমটি হচ্ছে : আল্লাহর রিযিক ভক্ষণ করো না অতঃপর যত খুশী গোনাহ্ করো।

দ্বিতীয় : আল্লাহর কর্তৃত্বের সীমা থেকে বেরিয়ে যাও তারপর যত পার গোনাহ্ কর।

তৃতীয় : এমন স্থানে চলে যাও যেখানে আল্লাহ্ তোমাকে দেখবেন না, অতঃপর যত পার গোনাহ্ কর।

চতুর্থ : যখন মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার রুহ্ কবজ করতে আসবে তখন যদি তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পার তাহলে যত খুশী গোনাহ কর।

পঞ্চম : যখন আজাবের ফেরেশতা তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে তখন যদি তা থেকে বাচঁতে পার তাহলে যত ইচ্ছা পাপ করে যাও।"[৪০]

পাঁচ : ইমাম হোসাইন (আ.) বলেছেন :

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ كُلَّمَا مُضِيَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ

অর্থাৎ "হে মানুষ, তোমার পুঁজি তোমার আয়ু াল। তোমার আয়ু থেকে যতদিন চলে যাচ্ছে ততই তোমার মূলধন সমাপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে।"[৪১]

ছয় :

قِيْلَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (ع) : كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللهِ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ وَ لِيَ رَبِّي فَوْقِي, وَ النَّارُ أَمَامِي , وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُنِي , وَ الْحِسَابُ مُحْدِقٌ بِي , وَ أَنَا مُرْتَهِنٌ بِعَمَلِي , لاَ أَجِدُ مَا أُحِبُّ , وَ لاَ أَدْفَعُ مَا أَكْرَهُ , وَالأُمُوْرُ بِيَدِ غَيْرِي , فَإِنْ شَآءَ عَذَّبَنِي وَ إِنْ شَآءَ عَفَا عَنِّي , فَأَيُّ فَقِيْرٍ أَفْقَرُ مِنِّي؟

"ইমাম হোসাইন (আ.)- কে প্র করা হলো : রাত্রি কেমন কাটালেন? তিনি উত্তরে বললেন : আমি এমন অবস্থায় রাত কাটিয়েছে যখন আমার রব (প্রতিপালক) আমার কাজ- কর্মের উপর সর্বক্ষন নজর রাখছেন, যখন জাহান্নামের আগুন আমাকে ধাওয়া করে চলছে এবং মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছে এবং হিসেব- নিকেশ (পৃথিবীতে এবং কিয়ামতের দিবসের জন্যে) আমাকে ঘিরে রেখেছে আর এভাবে আমি আমার কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করবো। এরকমটি নয় যে, সব কিছু আমার পছন্দ অনুসারে আমার সামনে আসবে আর যা কিছু অপছন্দ করি তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো। কেননা সকল কিছুর পরিচালনা তার হাতে। তিনি যদি চান আমাকে আযাব দিতে পারেন। আবার যদি চান ক্ষমা করে দিতে পারেন। সুতরাং আমার চেয়ে বড় অভাবী কে হতে পারে?"[৪২]

সাত : ইমাম বলেন :

إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوْا اللهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْتُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوْا اللهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيْدِ وَ إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوْا اللهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الأَحْرَارِ وَ هِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ

"একদল জান্নাতের লোভে আল্লাহর ইবাদত করে থাকে। তাদের ইবাদত ব্যবসায়িক ইবাদত। অন্য একদল লোক জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত করে থাকে। তাদের ইবাদত দাসত্বের ইবাদত। অপর একদল আল্লাহর শোকর আদায়ের লক্ষ্যে ইবাদত করে থাকে। তাদের ইবাদত মুক্ত মানুষের ইবাদত। এটাই সর্বত্তোম ইবাদত।"[৪৩]

আট : ইমাম বলেন :

مَا أَخَذَ اللهُ طَاقَةَ أَحَدٍ إِلاَّ وَضَعَ عَنْهُ طَاعَتَهُ , وَ لاَ أَخَذَ قُدْرَتَهُ إِلاَّ وَضَعَ عَنْهُ كُلْفَتَهُ

"যদি আল্লাহ কারো সাধ্যকে সীমিত করেন তবে তাঁর আনুগত্যের সীমাকেও সীমাবদ্ধ করে দেন এবং যদি কারো শক্তিকে াস করেন তবে তার অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহেও বিশেষ ছাড় দেন অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যক্তির সাধ্য অনুযায়ী আনুগত্য নির্ধারণ করেন এবং শক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব আরোপ করেন।"[৪৪]

অর্থাৎ আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তার শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী কর্তব্য দিয়ে থাকেন, সাধ্যের অতীত কোন কিছু কারো উপর চাপিয়ে দেন না। যেমনি করে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ্ বলেন :

(لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)

অর্থাৎ "আল্লাহ্ সাধ্যের অতীত কোন ব্যক্তির উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।"

নয় : ইমাম বলেন :

لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ فَلاَ تَبِيْعُوْهَا بِغَيْرِهَا فَإِنَّهُ مَنْ رَضِىَ مِنَ اللهِ بِالْدُّنْيَا فَقَدْ رَضِىَ بِالْخَسِيْسِ

"জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছুতে তোমাদের কোন মূল্য হয় না। সুতরাং জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করো না। যে ব্যক্তি দুনিয়া পেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যায় সে সর্বনিকৃষ্ট জিনিস নিয়েই সন্তুষ্ট হয়।"[৪৫]

দশ : ইমাম বলেন :

لاَ يُكْمَلُ الْعَقْلُ إِلاَّ بِإِتِّبَاعِ الْحَقِّ

"সত্যের অনুসরণ ব্যতীত আকলের (বুদ্ধিবৃত্তি) পরিপূর্ণতা আসে না।"[৪৬]

এগার : ইমাম বলেন :

شُكْرُكَ لِنِعْمَةٍ سَالِغَةٍ يَقْتَضِى نِعْمَةً آنِفَةً

"অতীত অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন নেয়ামত বয়ে আনে।"[৪৭]

বার : ইমাম বলেন :

لاَ تَأْمَنْ إِلاَّ مَنْ خَافَ اللهُ تَعَالَى

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় পায় তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করো না।"[৪৮]

তের :

قِيْلَ لَهُ مَا ٱلْفَضْلُ ؟ قَالَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ : مِلْكُ ٱللِسَانِ وَ بَذْلُ ٱلإِحْسَانِ

“ইমামকে প্র করা হলো যে মর্যাদা কিসে হয়? তিনি বলেন : “জিহ্বার মালিক হলে (অর্থাৎ যে কথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন সে কথা থেকে বিরত থাকা) এবং দয়া পরবশ হলে (অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করলে)।”[৪৯]

তথ সূ :

১। ইমাম হোসাইনের জন্মের তারিখের ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা আহলে বাইতের অনুসারীদের মাঝে প্রসিদ্ধ তারিখের বর্ণনা করেছি। এলাম আল ওয়ারা; তাবারসী, পৃ. ২১৩।

২। সম্ভবত আসমা বলতে ইয়াযিদ ইবনে সাকান আনসারীর কন্যাকে বুঝানো হয়েছে। আইয়ানুশ শিয়া, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ১৬৭।

৩। আমালী, তুসী, ১ম খ , পৃ. ৩৭৭।

৪। শাব্বার হাসানের অনুরূপ আর শুবাইর হোসাইনের এবং মুশবির মুসনের অনুরূপ- হযরত হারুনের পুত্র সন্তানদের নাম ছিল। ইসলামের নবী (সা.) তাঁর সন্তানদের তথা হাসান, হোসাইন ও মুসনকে এ নামে নামকরণ করেছেন। তাওজুল আরুস, ৩য় খ , পৃ. ৩৮৯। এ তিনটি শব্দ হি ভাষায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আরবী ভাষায় সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লিসানুল আরাব, ৬ষ্ঠ খ , পৃ. ৬০।

৫। মায়ানি আল আখবার, পৃ. ৫৭।

৬। ইসলামী উৎসসমূহে আকিকা সমন্ধে প্রচুর তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং সন্তানের সুস্থতার জন্যে অত্যন্ত ফলদায়ক বলে গণ্য করা হয়েছে। ওসায়েলুশশিয়া, ১৫তম খ , পৃ. ১৪৩।

৭। আল কাফি, ৬ষ্ঠ খ , পৃ. ৩৩।

৮। মাকতাল আল খাওয়ারেযমী, ১ম খ , পৃ. ১৪৬। কামালুদ্দীন, সাদুক, পৃ. ১৫২।

৯। সুনানে তিরমিযী, ৫ম খ , পৃ. ৩২৩।

১০। যাখায়েরুল উকবা, পৃ. ১২২।

১১। আল ইসাবা, ১১তম খ , পৃ. ৩৩০।

১২। সুনানে তিরমিযী, ৫ম খ , পৃ. ৩২৪। এ বিভাগে আহলে সুন্নাতের গ্রন্থাবলী থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হলো যেন তাদের জন্যে এগুলো সনদ হিসেবে কাজ করে।

১৩। আল ইসাবা, ১ম খ , পৃ. ৩৩৩।

১৪। তাযকিরাতুল খাওয়াস, ইবনে জাওযি, পৃ. ৩৪। আল ইসাবা, ১ম খ , পৃ. ১৩৩। কোন কোন ঐতিহাসিক এ ঘটনাকে ইমামের দশ বৎসর বয়সে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

১৫। ইরশাদুল মুফিদ, পৃ. ১৭৩।

১৬। রিজাল, কাশশী, পৃ. ৯৪।

১৭। মাকতালে খাওয়ারেযমী, ১ম খ , পৃ. ১৮৪।

১৮। হাজ্বীদের জন্যে যিলহজ্বের অষ্টম দিনে মিনাতে চলে যাওয়া মুস্তাহাব কাজ। তৎকালীন আমলে এ মুস্তাহাব কাজটি আমর করা হতো। কিন্তু আমাদের সময়ে এটাই প্রচলিত যে যিলহজ্বের অষ্টম দিনে সরাসরী আরাফতের ময়দানে চলে যেতে হয়।

১৯। কামেল আয যিয়ারাত, পৃ. ৬৮। মুশিরুর আহযান, পৃ. ৯।

২০। লুহুফ, পৃ. ৫৩।

২১। কামেল আয যিয়ারাত, পৃ. ১০৫।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

২৫। আকদুল ফারিদ, ৩য় খ , পৃ. ১৪৩।

২৬। ইরশাদুল মুফিদ, পৃ. ২১৪।

২৭। মানাকিবে শাহরে আশুব, ৩য় খ , পৃ. ২২৪। উসুদুল গাবা, ২য় খ , পৃ. ২০।

২৮। মরহুম শেখ মুফিদ (রহ.) লাতিফের দু'টি অর্থ করেছেন - যা আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। (ক) সূক্ষ্ম বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং যার কাজ- কর্ম অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ণ ও সূক্ষ্ম, (খ) যিনি তাঁর বান্দাদের মঙ্গল ও দয়া করে থাকেন।

২৯। উপরোক্ত দোয়াটি আল্লামা সাইয়্যেদ ইবনে তাউস 'ইকবাল' নামক গ্রন্থের পৃ. ৩৩৯- ৩৫০, বালাদুল আমিন; কাফআমি, পৃ. ২৫১- ২৫৮, বিহারুল আনওয়ার, ৯৮তম খ , পৃ. ২১৩, মাফাতিহুল জিনান, মুহাদ্দীসে কোমী এবং আরো অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ দোয়ার আরবী পাঠ্য থেকে উপকৃত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মাফাতিহুল জিনানের আরাফাত দিবসে ইমাম হোসাইন (আ.)- এর দোয়া দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি ।

৩০। উসদুল গাবা, ২য় খ , পৃ. ২০।

৩১। যিকরুল হোসাইন, ১ম খ , পৃ. ১৫২ (রিয়াদুল জিনান, বোম্বে থেকে প্রকাশিত), পৃ.: ২৪১, এবং আনসাবুল আশরাফ গ্রন্থদ্বয় থেকে উদ্ধৃত)।

৩২। সূরা নাহল : ২২।

৩৩। তাফসীরে আইয়াশী, ২য় খ , পৃ. ২৫৭।

৩৪। মানাকিবে শাহরে আশুব, ২য় খ , পৃ. ২২২।

৩৫। আল ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ্, ১ম খ , পৃ. ২৫৩।

৩৬। 'সুমুয়ুল মানী', পৃ. ১০৪- এর পর থেকে ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৭। তোহাফুল উকুল, পৃ. ২৪৪।

৩৮। তোহাফুল উকুল, পৃ. ২৪৬।

৩৯। আমালী, সাদুক, পৃ. ১২১।

৪০। বিহারুল আনওয়ার, ৭৮, পৃ. ১২৬ (ভাবার্থ তুলে ধরা হয়েছে)।

৪১। বালাগাতুল হোসাইন, পৃ. ৮৭। (দইলামীর রচিত 'ইরশাদুল কুলুব' থেকে উদ্ধৃত)।

৪২। বিহারুল আনওয়ার, ৭৮তম খ , পৃ. ১১৬।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৪৪। বিহারুল আনওয়ার, ৭৮তম খ , পৃ. ১১৭।

৪৫। বালাগাতুল হোসাইন, পৃ. ৩০৮ ।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭। বিহারুল আনওয়ার, ১৭তম খ ।

৪৭। বালাগাতুল হোসাইন, পৃ. ২৯৩।

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।

সূচীপত্র

জন্ম. 3

হোসাইন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 4

হোসাইন পিতার সাথে 6

ভাইয়ের সাথে ইমাম হোসাইন 7

মুয়াবিয়ার শাসনামলে ইমাম হোসাইন (আ.) 8

ইমাম হোসাইনের আন্দোলন 10

ইমাম হোসাইন (আ.)- এর আচরণ ও শিষ্টাচার 17

তথ্যসূত্র : 29